"গীতারত্ন" শ্রীপ্রীতিকুমার ঘোষ প্রবর্তিত ধর্ম ও জাতীয়তাবাদী বাংলা মাসিক পত্রিকা (৬৪ তম বর্ষ)

পার্থসারথি

(মুদ্রিত রূপে প্রকাশনা: জুন, ১৯৬০ থেকে মার্চ, ২০২০/অন্তর্জাল প্রকাশনা: এপ্রিল, ২০২০ থেকে)

Website: https://www.parthasarathipatrika.com

৪৬তম অন্তর্জাল সংখ্যা

৯ই মাঘ, ১৪৩০ / 24.01.2024

-:- সম্পাদক -:-

সুনন্দন ঘোষ

DO NOT COPY

-: সূচীপত্র :-

প্রীতি-কণা	শ্রীপ্রীতিকুমার ঘোষ
স্মৃতিচারণ	শ্রীমতী শুক্লা ঘোষ
যোগবাণী	পরমহংস যোগানন্দ
কর্মরহস্য	শ্রী অনিলবরণ
তিন নদীর দেশ – মুন্নার	শ্রী অরূপ কুমার ভট্টাচার্য
অজানার ঠিকানায়	শ্রীলা মৈত্র
চেনা না-চেনার রোজনামচা	শ্রী সুনন্দন ঘোষ

Introduced by Sri Priti Kumar Ghosh in June, 1960, PARTHASARATHI Bengali Monthly Magazine: RNI 5158/ 60, published in print format for sixty years, converted to e-magazine by Sri Sunandan Ghosh, Editor & Publisher in April, 2020 during prolonged Nationwide Lockdown and now being published through the Website: https://www.parthasarathipatrika.com
Contact: 182 Jessore Road, Flat- D/1, Kolkata- 700074. WhatsApp: 9433284720.

DO NOT COPY

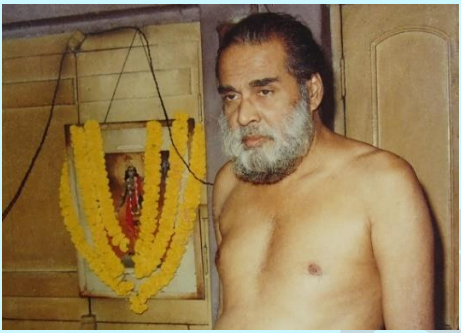

(১০ই মার্চ, ১৯২৬ – ২৪শে নভেম্বর, ১৯৮৬)

প্রীতি-কণা

“আমি আজ সমস্ত অতীতকে ভুলে যেতে চাইছি। শুধু ততটুকু থাক আমার সাথে যা ভবিষ্যত জীবনকে গড়বার পক্ষে সহায়তা করবে। সমস্ত অতীতই আমার জীবনে মধুময় ও প্রেমময়। এই অতীতই আজ আমাকে এখানে ও বর্তমান জীবনে পৌঁছে দিয়েছে। অতীত হয়তো কোথাও নিষ্ঠুর হয়েছে, কিন্তু সে দিয়েছে শিক্ষা, জ্ঞান ও বিপুল অভিজ্ঞতার ঐশ্বর্য। যেখানে হৃদয়ের তিক্ততা পেয়েছি, তারই মাঝে এসেছে শাশ্বত স্পন্দন। যেখানে কঠোর বেদনা ঠিক সেইখানেই পেয়েছি করুণাময়ীর অপার স্নেহ। সকলে হয়তো ছেড়েছে আমাকে, -- ছাড়েনি মা, ছাড়েনি রাধা। স্নেহ মমতার শক্তি বল, প্রেম ভালবাসার গভীর বন্ধন, -- সব কিছুই শাশ্বত।” **

** (শ্রীপ্রীতিকুমারের ব্যক্তিগত দিনলিপি থেকে গৃহীত। রচনাকাল ১লা জানুয়ারী, ১৯৭৬)

DO NOT COPY

চৈত্র, ১৩৯৭ সংখ্যায় আমি পার্থসারথির সেই পাঠকবর্গকে হতাশ করেছি, যারা বইটি হাতে পেয়েই আমার লেখা খুলে পড়তে আরম্ভ করেন। তারা খুব চমকিত হয়েছেন, কারণ, আমার লেখা নেই।

প্রেসের কর্তৃপক্ষ আজকাল ইংরাজী মাসের ২০, ২১ তারিখের বদলে ২৮, ২৯, ৩০ তারিখ করে ফেলেছেন। তাগাদা দেবার কেই বা আছে? এবার আমার লেখা যাবার আগেই তাঁদের কম্পোজ সারা। তদুপরি সম্পাদক মশাই গতমাসের লেখাটি পছন্দ করেন নি – বড় বেশী ব্যক্তিগত হয়ে গেছে। সব কথা সব লোক জানবে কেন? অগত্যা সে লেখা বাদ চলে গেল। যিনি রঙ্গমঞ্চে এসেছিলেন তিনি বেঁচে গেলেন।

এবার একটা স্পষ্ট কথা বলি। চাঁদা নেওয়ার সময় আমাকে পার্থসারথির যেসব গ্রাহক সরবে বা নীরবে সহমর্মী, তাদের কথা নিশ্চয়ই আলাদা, কিন্তু মুষ্টিমেয় কয়েকজন যাঁরা নির্ধারিত সময়ের পরে পনেরো টাকা চাঁদা দিয়ে বা না দিয়ে সহমর্মিতা প্রকাশের পরিবর্তে সারা বছর সমালোচনার ছুরিটাকে শানিয়ে রাখেন, তাদের সম্বন্ধে অন্যভাবে ভাবতে হবে।

আমার বড় দেমাক। হবেই তো! আমি নিজেকে খুব সাধারণ মনে করলেও আমি একজন পরম সাধকের ঘরনী। সেই ঘর আমি এখনও আগলে রেখেছি। আজ হয়তো আমার দুর্যোগ চলছে। যদি মনে করি আমার সন্তান বড় হয়ে গেছে, তাহলে তো আমার আর কোন পিছুটান নেই। আমার দুঃসময়ে যাঁরা আমাকে সাহায্য করেছিলেন, তাদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা বারবার জ্ঞাপন করেছি।

শ্রীপ্রীতিকুমার সারা জীবন যাদের জন্য কারণে অকারণে সময় ব্যয় করেছেন, তারা এখনও কি অক্লেশে মিথ্যা কথা বলে যান, দেখে বড় অবাক লাগে।

DO NOT COPY

আমার কাছ থেকে যে কত শিক্ষা নিলো, এখন আমার কাছেই সেগুলি apply করছে দেখি! বুঝতে পারি তবু চুপ করে আছি। মিথ্যা কথা আমরা কখনও শ্রীপ্রীতিকুমারের কাছে বলিনি। তিনি ছিলেন অন্তর্যামী। অন্যায় করে স্বীকার করলে সঙ্গে সঙ্গে মাফ করে দিতেন। তখন বয়স কম ছিলো। পরিপূর্ণতা আসেনি, অধীনতা মেনে নিয়েছিলাম। আজ বড় কষ্ট হয়। আমার শুধু নিজেকেই নিজের ভালবাসতে ইচ্ছে করে। এখন কোথাও গিয়ে সময় নষ্ট না করে বাড়ীর মধ্যেই এ ঘর থেকে ও ঘরে যাই।

আমার বাড়ীটা খুব ফাঁকা হয়ে গেছে। কিন্তু যাদের ঘর ভরা, তারাও আমাকে সময় মতো কিছু জ্ঞান দেয়। কিশোর আমাদের অতি শুভাকাঙ্ক্ষী। সেও যখন বলে, "মামীমা, আর চার পাঁচ মাস মাত্র কষ্ট আছে," বড় হাসি পায়। কিশোর আমাদের পরিবারের সব সমস্যার মুখোমুখি হয়, তাই তার কথা আমাকে শুনতে হয়! কিন্তু তার এই astrology-টা আমাকে কোথাও যেন ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়। আমি এখন একজনের কথায় বিশ্বাস করি, তিনি হচ্ছেন আমার পুত্তর। কিন্তু seriously কিছু জিজ্ঞেস করলেই চুপ করে যায়। আমি আজকাল ওর "হ্যাঁ" অথবা "না" শব্দটা একটু বুঝবার চেষ্টা করি। কিন্তু সব বুঝেও একটা জায়গায় যে শূন্যতা, সেটা আমার প্রারব্ধ না কর্মফল চিন্তা করে উঠতে পারি না। প্রশ্ন তো আমার একটাই – এই বাড়িটা তার সদস্যদের নিয়ে কবে পূর্ণ হবে?

কেউ নিরাশ করেন, কেউ বা আশ্বাস দেন। শ্রীপ্রীতিকুমার বলতেন, "তোমার যদি অসুখ করে কাউকে জানালে দেখবে সে তোমাকে হাজার জ্ঞান দিচ্ছে, যেন সে বিশ্ববিখ্যাত চিকিৎসক। তোমাকে চুপ করে শুনে যেতে হবে।" – সে কথাটা মনে রেখেছি। এখন কেউ 'কেমন আছেন'- জিজ্ঞেস করলেই সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিই – 'ভালো।' কারণ ভালো থাকলে আর জবাবদিহি করতে হয় না।

গত ১০ই মার্চ শ্রী প্রীতিকুমারের জন্মদিন পালন করলাম আমরা। নীরেনদা সঙ্গীতানুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন। প্রচুর জনসমাগম হয়েছিল। চোখে পড়বার

মত। অনুপস্থিতির সংখ্যাও নিতান্ত নগণ্য ছিল না। পার্থ আসেনি। দরকার পড়েনি। যখন আসবে একথলে বিপদের গল্প নিয়ে আসবে। ওকে তো আমি বহু বছর ধরে জানি। আরেকজন আসেন নি। বাপীর মামু। আমার ও আমার পুত্রকে দেখে আমাদের দুঃখের assessment করা খুব কষ্ট। তাই আত্মীয়স্বজনের এক অংশের সহানুভূতি আর আমি অর্জন করতে পারিনি। আমার ভ্রাতার শ্রীপ্রীতিকুমারের সাথে খুব সখ্য ছিল। ফলে আমাদের কাছে যাঁরা আসেন তাঁরাও আমার ভ্রাতাকে ভালোবাসেন, পছন্দ করেন। মোটামুটি আমাদের সমাজে তাঁর জানাশোনা আছে। কিন্তু এবার দেখলাম তিনি ১০ই মার্চ অনুপস্থিত রইলেন। কিশোর হলে বলতো – 'দূর! অত চিন্তা করে কি হবে? যার যা ভাব!'

আমরা যারা না প্রকাশ করে অনেক কিছু চাই, তারা আমাদের নিজেদের ওজন বুঝি না। আর সেই জন্যই এত ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়। সারা জীবন আমরা কোনও দায়-দায়িত্ব পালন করি না – কিন্তু আশা করি অনেক সম্মান।

দিনগুলি কেটে যায়। সময় নেই, অসময় নেই, সেই জনসমাগমের থেকে রেহাই পেয়েছি কিছুটা, সবটা নয়। সবটা রেহাই পেলে অনেক ভালো করে লিখতে পারতাম। কিন্তু যেই একটু মনস্থির করে লিখতে বসি, অমনি দরজায় করাঘাত। এত লোকের কি আমার কাছে দরকার থাকে? মাঝে মাঝে বাপীকে বলি – "বাইরে থেকে তালাচাবী দিয়ে যা।" এইতো আমার হাল!

কোনও কাজে নিযুক্ত হলে সবাইকে বলা যায় না। কেউ কেউ শুনে এমন একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলেন, যেন ওই কাজটা নিয়ে আমি তাকে ফেলে কতদূর এগিয়ে গেলাম। শ্রীপ্রীতিকুমার এইজন্য কিছুকিছু খবর কোনও কোনও লোকের কাছে বলতে নিষেধ করতেন। তিনি ঐ দীর্ঘ নিঃশ্বাস এড়াতে চাইতেন। আমার গাম্ভীর্য বড় কম। তাই কিছু বলে নিজেই বিপদে পড়ে যাই। এখন দেখি অনেকে

DO NOT COPY

কোনও কোনও কাজ করেন, আমার কাছে বলেন না। আমি মুখে কিছু না বললেও নিজেকে সরিয়ে নিই।

আবার আসি পার্থসারথির গ্রাহক প্রসঙ্গে। কিছু কিছু গ্রাহক আছেন নিত্য ঠিকানা বদল করেন। আর সেই ঠিকানা বছরের মাঝামাঝি জানান। সুন্দর করে একটি Register maintain করলে তাতে কাটাকুটি করতে বড় খারাপ লাগে। তারপর "এই সংখ্যা পাইনি, ওই সংখ্যা পাইনি।" সাথে আছে ডাক বিভাগের দাক্ষিণ্য। আমাদের গ্রাহক হিসেব করে বই মুদ্রিত হয়। তাই যে কোনও রকম অব্যবস্থা হলেই মেটাতে খুব অসুবিধা হয়। তখন দশ টাকা দিলেও একটি বই পাওয়া যায় না। আমার আশ্চর্য লাগে এই দু একজন গ্রাহকেরই বা বই অনিয়মিত যায় কেন? অন্য নিরানব্বই শতাংশ গ্রাহকের তো এ অভিযোগ নেই?

এরপর আসি লেখকদের প্রসঙ্গে। যারা লেখা দেন তাদের লেখা সম্পাদক মশাই বাছাই করেন। কবিতা বা ছোট্ট লেখা থেকে পাঠকদের বোঝা উচিৎ যে সম্পাদক মশাইয়ের বাংলা ভাষায় যথেষ্ট দখল আছে। তার উপায় নেই বলে কোনও কোনও লেখা প্রকাশ করতে হয়। কিন্তু অমনোনীত কোন লেখা যদি প্রকাশিত না হয় লেখকদের কি আনাগোনা! একেতো ৬টা ৭টায় ফিরি। বাইরের জামাকাপড় না কেচে পূজা করতে পারি না, সন্ধ্যা দিতে পারিনা। স্বাভাবিক ভাবেই বাথরুমে ঢুকলে দরজা খুলে দেবার কেউ থাকে না। কেউ কেউ রেগে চলে যান। বেশ কিছুদিন ধরে এই ভুল বোঝাবুঝিটা চলছে। তাই আজ ব্যক্ত করে ফেললাম।

শ্রী প্রীতিকুমারের পার্থসারথি প্রকাশনার প্রতি অত্যন্ত আগ্রহ ছিল বলেই আমরা এখনও বইটি প্রকাশ করবার চেষ্টা করছি। কিন্তু একটি বিজ্ঞাপন ছাড়া আর কোনও টাকা বাইরের থেকে আসেনা। এলেও ভীষণ ভীষণ ভাবে অনিয়মিত। বিষয়টা এত delicate, কিছু বলতে পারি না। লজ্জাও করে। ফলে ইচ্ছে থাকলেও পার্থসারথির সমৃদ্ধির জন্য অনুষ্ঠান করতে পারিনা, বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করতে

DO NOT COPY

পারি না। ছেলেটার জন্য বড় কষ্ট হয়। সেদিন মনু যখন একটি থালার উপর গ্লাস বাটি সাজিয়ে এনে বাপীর হাতে দিল – 'তোমার জন্মদিনে' – বলে, আমার চোখে জল এসে গেছিল। ছেলেটা তো আমার। তাকে কেউ ভালোবাসলে আমার ভালো লাগবে সেটাই স্বাভাবিক। তবে কেউ যদি বেশী ভালোবেসে আমারই রান্না করা মাছ মাংস থেকে প্রায় সবটাই তাকে বেড়ে দেয়, অন্যে আর কিছু পায় না, তাহলেও আবার আমার মোটেও ভালো লাগে না।

আমি জানি আমার লেখা কোথায় শুরু হয়, আর কোথায় শেষ হয়, তার কোনও মাত্রা থাকে না। যখন যেমন মনে হয়, লিখি। একটি ঘটনা লিখতে লিখতে আরেকটি ঘটনা মনে পড়ে যায়। মুস্কিল হয় সেখানেই। কিন্তু লিখতে হয়। কারণ একবার লেখা না বেরোলে বেশ কিছু পাঠককে কারণ জানাতে হয়। তার চেয়ে যা পারি লেখা ভালো। সম্পাদক মশাইর হাতে পড়লে পুরো form- টাই বদলে যেতে পারে। এটুকুই ভরসা .....।

– – – – – – – – – – – – –

(** রচনাকাল – এপ্রিল, ১৯৯১)

"ভাগবতী শক্তি সর্বদা অন্তরালে কাজ করে চলেছে। একদিন, যখন হয়তো আদৌ আশা করা যায় নাই, বাধাটি ভেঙে পড়ে, মেঘ উড়ে যায়, আলো ও রৌদ্র আবার ফিরে আসে।"

------ শ্রীঅরবিন্দ

DO NOT COPY

অনুবাদক-স্বামী বিদ্যানন্দ গিরি

হতাশার বীজ দূরীকরণে দিব্য-পদ্ধতি

আমেরিকার মত সম্পদশালী দেশেও বিত্তের আড়তে বসে হতাশার কান্নায় আজ গগন বিদীর্ণ প্রায়। দেশের সর্বত্র প্রাচুর্য্যের আলোক বর্ত্তিকার তলায় রুচিহীন জাঁক জমক, প্রলুব্ধকারী ইঙ্গিতবহ বিপণি সমূহের মাঝে এবং দ্রুত নিঃশব্দে ধাবমান চক্রযানের প্রতিযোগিতার অন্তরালে দারিদ্র্যের নিথর, নিস্তব্ধ, বিক্ষোভময় বুক ফাটা কান্না। একদিকে প্রাচ্যের পথে পথে মলিন, ছিন্ন বস্ত্রাচ্ছাদিত ভিখারীর মেলা, অপরদিকে পাশ্চাত্যে, ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের স্বর্গোদ্যানে, ধনিক-গোষ্ঠীর জম-জমাট আসরে, দলে দলে অর্থহীন, সম্পদহীন সুসজ্জিত নরনারী অনশনে বা অর্দ্ধাশনে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। সুসজ্জিত ধনী আর জীর্ণ বস্ত্র পরিহিত দরিদ্র উভয়েই নিজের নিজের ঢঙে, চলায় ফেরায় নিজেদের প্রকাশ করছে, কিন্তু পাশ্চাত্যের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় যারা এখনও দরিদ্র অথচ তাদের ধনীর ন্যায় পোষাক-আসাক প্রয়োজন তাদের জন্য আমার বড় করুণা হয়।

বিবেকহীন, হৃদয়হীন, ধনকুবেরগণ মুখে অট্টহাসি নিয়ে, অমূল্য রত্নভূষিত পোষাকে সুসজ্জিত হয়ে, স্বার্থপরতায় পাথরবৎ আচরণে অভাগা দরিদ্র্য ক্লিষ্ট, আত্মবিশ্বাস-হীনদের পাশ কাটিয়ে চলে যায়। কোথায় তবে যীশুর বাণী প্রতিধ্বনিত হচ্ছে, যা বলছে - 'মানুষ ঈশ্বরের প্রতিমূর্ত্তি', অসমতা, অবিচারের গহ্বরে কত গভীরে ঠেলে ফেলছে?

শিল্পপতিদের সচীৎকার মন্তব্যে, "অধিক ক্রয় কর এবং অর্থ সঞ্চালন অব্যাহত রাখ", সমস্যার সমাধান হবে না। হতাশার বীজকে খুঁজে বার করতে হবে এবং তাকে সমূলে দগ্ধ করতে হবে। অধিক ক্রয়ে বাধ্য করা এবং প্রয়োজনাতিরিক্ত অধিক ক্রয় করা, কিস্তিবন্দি পরিকল্পনায়, তাদের আমৃত্যু দাসত্বে পরিণত করা হয়।

পৃথিবীর ইতিহাস, শুধু হানাহানির ইতিহাস। ভাই ভাইকে খুন করছে; এক গোষ্ঠী অপর গোষ্ঠীকে উৎপীড়ন করছে, এক জাতি অপর জাতিকে ধ্বংস করছে, বড় শিল্পপতি ছোট ব্যবসায়ীর শিরচ্ছেদ করছে তাদের গ্রাস করে।

তরবারি, যুদ্ধ সামগ্রী, কামান, বোমা দ্বারা ধ্বংসের তাণ্ডব লীলা করেও বাঞ্ছিত ফললাভ করা যাবে না যতক্ষণ না মানুষ সামাজিক, অন্তর্দেশীয়, আন্তর্জাতিক বিধি নিয়মাদি সম্পর্কে যে অজ্ঞতা রয়েছে মনুষ্য জীবনে তার সদ্ব্যবহার করছে। আত্ম-সিদ্ধিকারী, অপরকে প্রতিহতকারী মাধ্যম পারস্পরিক দুর্দশাকে অধিক ঘোরালো করে তোলে। শান্তিপূর্ণ, উন্নততর জীবন যাপনের সার্বজনীন তথা আন্তর্জাতিক বিধিনিয়মাদি সম্পর্কে ভুল বোঝাবুঝিই হতাশা বা উদ্যমহীনতা, দুর্ভিক্ষ, প্লেগ, সামাজিক, শৈল্পিক, জাতীয় আকস্মিক বিপর্য্যয়, বিপ্লব বা যুদ্ধের জন্য দায়ী। আন্তর্জাতিক ভুল বোঝাবুঝির গর্ভে স্বার্থপরতারূপ শয়তান সন্তানের জন্ম, যা 'বাস্তবিক' পক্ষে অর্থনৈতিক বিপ্লবের হেতু।

ব্যক্তিগত, সমাজগত, জাতিগত, অন্তর্জাতিগত এবং শিল্পগত বিভিন্নরূপ স্বার্থপরতা সার্বজনীন স্বার্থপরতার বিভিন্ন শিশুরূপ। আত্ম-স্বার্থ এবং সুখের নেশায় মনুষ্যসৃষ্ট স্বার্থপরতা জীবন প্রবাহের ভ্রান্ত পথ। অবশেষে আত্ম-বিশ্লেষণে দেখা যায় স্বার্থপরতা আগে বা পরে প্রকৃত আত্ম-স্বার্থের এবং সুখের পরিপন্থী। এক সহস্র জন যদি একটি সম্প্রদায়ে থাকে, এবং প্রত্যেকে যদি প্রত্যেকের শত্রু হয়, তা হলে প্রত্যেককে তার নয় শত নিরানব্বই জন শত্রুকে প্রতিহত করার পর সে স্বাধীনভাবে সফলতার সঙ্গে কোন কাজ করতে পারে। একটি জাতিতে দশকোটি ব্যবসায়ী ব্যক্তি রয়েছে। প্রত্যেকে চায় কোটিপতি হতে; তা হলে প্রত্যেককে ৯,৯৯,৯৯,৯৯৯ জন ব্যবসায়ী-শত্রুর সঙ্গে সংগ্রাম করতে হবে। শিল্পগত যুদ্ধ এবং প্রতিযোগিতা মুষ্টিমেয়কে, যাদের প্রচুর আছেই, দ্রুত আরও কিছু পাইয়ে দেয়। অপর সকলেই প্রয়োজনাতিরিক্ত পেতে প্রয়াস পায় এবং সারাজীবন আমৃত্যু তারই পেছন পেছন ছোটে আর আরও অধিক কেনা চাই, খাদ্য সংগ্রহ করা চাই অথবা হৃত স্বাস্থ্য উদ্ধার

করা চাই, সর্বসময় বিলাসপ্রিয় অভ্যাস বা উছৃঙ্খলতা বাড়িয়েই চলতে থাকে। অপরকে মেরে বাঁচার চেষ্টা এবং অপরকে নিঃস্ব করে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বিলাসময় জীবন যাপন করার প্রয়াস ঈশ্বর-সৃষ্ট নিয়ম-বহির্ভূত পাপ; এই পাপই শিল্প-পরিচালনাকে নিয়ন্ত্রণ করে। ঈশ্বর-সৃষ্ট সদ্-কর্মের নিয়মাদি তা' পারিবারিক জীবনেই হউক, ধর্মমন্দিরেই হউক আর বিপণিতেই হউক সর্বত্রই একই নিয়ম পালন করা উচিত অন্যায় এবং অসাম্য থেকে মনুষ্য সভ্যতাকে রক্ষাকল্পে।

আত্ম-সুখের উৎকর্ষতার মাত্রা হিসেবে কোটিপতি হওয়ার বাসনা সর্বৈব মিথ্যা। যে কোটিপতি হতে চায় সে শুধু নিজেরই ক্ষতি করে না, সেই পথ নির্দেশ করে অপরকে দুঃখের সাগরে নিক্ষেপ করে। হোটেলের সাধারণ করণিক যখন মহামূল্যবান পোষাকাদি সজ্জিত কোটিপতিকে সগর্বে সুদর্শন, নামী চক্রযান থেকে নামতে দেখে, তখন সে তার বাহ্যিক সুখের প্রতি কটাক্ষ করে, এবং সেই সুখের সমকক্ষতা দেখাতে গিয়ে সে ধার করে, প্রতারণা করে, নিজেকে সজ্জিত করে এবং দামী পুরানো গাড়ী ক্রয় করে।

কোটিপতি হতে গিয়ে ভয়ে, মাত্রাতিরিক্ত পরিশ্রম, স্নায়বিক দুর্বলতায় এবং হৃদরোগে স্বাস্থ্যহানি ঘটে এবং সুখও হারায়। খুব কম লোকই অনুধাবন করতে পারে যে এই পথ অনুসরণকারী, চিন্তাশক্তিহীন মূঢ়দের বিপথগামী করে এবং জীবনকে বিষময় করে তোলে, সুখের ভান করতে শেখায়। সভ্যতার এই মিথ্যা উৎকর্ষতা, যা' "জীবনের চরম উদ্দেশ্যই কোটিপতি হওয়া" - মানুষকে অধিক থেকে অধিকতর বোকা বানায়, মূঢ় করে তোলে, সংগঠিত অসৎ উপায়ে অর্থ সংগ্রহ করে এবং ক্লিষ্ট বুভুক্ষদের গ্রাস কেড়ে নিয়ে। এ ছাড়া, আপাত বহুমূল্য বদ অভ্যাস, ব্যসনপ্রিয় অলস জীবন, চাটুকারদের মুখে মুখে হাল্কা প্রশংসা, সম্পদের তামাসায় বিমুগ্ধ হয়ে মানুষকে আরও প্রলোভন-উন্মত্ত হতে কষাঘাত করে, তামস-ময় জড়ত্বের দিকে ঠেলে দেয়, শিল্প বাণিজ্যের বিষময় বক্রতা দ্বারা এবং অন্ধকারময় কর্মের দ্বারা বিলাসপ্রিয়তা, যে কোন উপায়ে আরও অধিক অর্থ সঞ্চয়ের বাসনা, দারিদ্র্যের ভয়, সমাজে বা পরিবারে তথাকথিত মেকি সম্মান খোয়াবার আশঙ্কা, এবং

স্বার্থপরতা অপরাধের, কার্পণ্যদোষের এবং সহানুভূতিহীনতার অগ্রগামী দূত। প্রত্যেকেই যদি সহজ সরল জীবন-যাপন করে, দুঃখ উৎপাদনকারী, ব্যসনপ্রিয় জীবন-যাপন অপসৃত হবে এবং মানুষ তখনই আত্মোন্নতির প্রচেষ্টায় অধিক সময় দেবে।

সর্বশক্তিমান ডলাররূপী কবরের দ্বারের দিকে সুখের বা ধনী হবার নেশায় ধাবমান ব্যক্তিকে কি করে নিরস্ত করা যায়?

এর প্রতিকার স্বার্থপরতাকে সমূলে উৎপাটন; সরল জীবন-যাপন এবং উচ্চ চিন্তা হবে সভ্যতার মাপকাঠি; জাঁক-জমকময় বিলাসিতাকে নির্বাসন দাও; অত্যুঙ্গ করসম্পন্ন বৃহৎ ভূসম্পত্তি, বড় বড় অট্টালিকা, চাকর-বাকর, সেবিকা, দামী দামী সাজ-সজ্জা, বহুমূল্য যান-বাহনাদির মালিকানার বাসনাকে প্রশ্রয় দিও না। যে অর্থের গদিতে বসে আছে, অথচ দারিদ্র্য-ক্লিষ্ট মৃতপ্রায় বুভুক্ষুকে মাড়িয়ে চলে যায়, তাকে সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ কর। দামী দামী পোষাক-আশাক, সাজ-সজ্জাকে উপহাস কর - তবেই সাম্য এবং ভ্রাতৃত্ব ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠিত হবে।

আমেরিকার সাধারণ নাগরিক, যারা সাধারণতঃ স্বভাবগত ব্যবসায়ী, অর্থের দাবিতে তাদের প্রতি জনে বৎসরে দুহাজার ডলার উপার্জ্জন করে প্রতিদিন সকাল আটটা থেকে সন্ধ্যা ছটা পর্য্যন্ত কারখানার কয়েদখানায় কঠোর পরিশ্রমের ঘানি টেনে এবং বিশ বৎসরে চল্লিশ হাজার ডলার উপার্জ্জন করে। যদি তাকে সঞ্চয়ের পরিমাণের কথা জিজ্ঞাসা করা যায়- সে বলবে, 'জমাবো কোত্থেকে? আর কিছু রোজগার করে ঋণ শোধ করার পর, জমাবার প্রশ্ন।' উপার্জ্জনের এক চতুর্থাংশ সে ব্যয় করে অপুষ্টি এবং অসম খাদ্যের পেছনে। অর্ধেক টাকা যায় আসবাবপত্রে এবং গাড়ীর ফাঁদে, যে ফাঁদ ক্রমাগত জড়িয়েই রাখে। প্রতি বৎসর নিত্য নূতন মডেলের গাড়ীর অভিলাষ চির-দাসত্বের জন্ম দেয়, যার পরিণতি আরও উপার্জ্জন আর ঋণ শোধ করা। এরই ঘোর-পাকে ভয়ে, দুশ্চিন্তায়, আর্থিক-দাসত্বে বয়সের ভারে অবসন্ন হয়ে পড়ে। ঘটনাচক্রে যদি হাজার চল্লিশেক ডলার জমায়ও, অস্থির হয়ে ষ্টক

মার্কেটে গিয়ে বিনিয়োগ করে বিনা পরিশ্রমে দ্বিগুণ অর্থ লাভের আশায় বা দ্রুত বড়লোক হওয়ার নেশায়। হায়! দুর্ভাগা হয়ত ফিরে আসে রিক্তহস্তে। ষ্টক মার্কেটের ব্যাঘ্র যদি তার অর্থ একান্ত নিঃশেষ নাও করে, তবে ব্যাঙ্ক-দেউলিয়া-রূপ নেকড়ে সবই নিঃশেষিত করার জন্য ওঁৎ পেতে থাকে। তখন হয়ত সে বয়সের ভারে দুর্বল, লোক-সেবা করবার আর শক্তি নেই, বাঁচারও আর কোন পন্থা নেই। চিড়িয়াখানার একটি জন্তুর জীবনের যে নিরাপত্তা নিশ্চিন্ততা রয়েছে, বিত্তশালী দেশের একজন সাধারণ নাগরিকের জীবনে সেই ভবিষ্যৎও নেই।

বৃহৎ-শিল্প ক্ষুদ্র-শিল্পকে গ্রাস করে এবং ব্যষ্টির আত্ম-প্রকাশের আশা আকাঙ্ক্ষাকে গুঁড়িয়ে দেয়, স্বাধীনতাকে অপহরণ করে, সুঠাম-দেহ-সম্পন্ন পরিশ্রমীকে নিস্তেজ করে দেয়, বাণিজ্য-ব্যাঘ্র শিল্প-ব্যাঘ্রকে গ্রাস করতে চায়, পরস্পর জয়ের জন্য দর কষাকষি করে, হয় দর-দাম বাড়িয়ে দিয়ে, না হয় খাদ্য-শস্য শূকরদের খাইয়ে অথবা ফল-ফলাদি নদীর জলে ভাসিয়ে, কিন্তু কদাচ বৃত্তিহীন বা অনশনগ্রস্তদের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে দেবে না।

একটি প্রতিষ্ঠান অপরের উন্নতিতে স্বার্থপরতার খড়্গ নিক্ষেপ করে নিজেকে ফাঁপিয়ে নিতে পারে, কিন্তু অপরে অথবা তদপেক্ষা অধিক শক্তিশালী শিল্প-যোদ্ধা তার বিরুদ্ধেও প্রয়োগ করতে পারে। "সর্বাধিক সদস্যদের জন্য সর্বাধিক মঙ্গল" - এই দিব্য-নিয়মকে অতীতে বৃহৎ বৃহৎ শিল্প লঙ্ঘন করেছে। যার জন্য এরা অসফল অস্বচ্ছ। যারা দেশকে গড়েছে, যখন তারা আর দেশের সেবা করতে পারে না, তাদের পশু অপেক্ষাও অবজ্ঞা করা হয়, যখন তাদের বৃদ্ধ অশ্বের ন্যায় মরতে দেওয়া হয়, তখন সেই নৈরাশ্য থেকেই জেগে ওঠে ঈশ্বরের-দূত দিব্য নিয়ম যা' সেই অসহায়, দুর্বল সন্তান তথা সবল সন্তান উভয়কেই সমানভাবে রক্ষা করে। তারা সংগোপনে অতি দ্রুত মনুষ্য-সৃষ্ট শিল্পের স্বার্থপরতার রীতি-নীতি ধূলিস্যাৎ করে দেয়। বাণিজ্যে শিল্প-প্রাধান্যের লড়াই ডেকে আনে বিধ্বংসী যুদ্ধ। শান্তির সময়ে শিল্প-প্রলোভন মারাত্মক উদ্যমহীনতার কারণ। সুতরাং 'সম্পদ-পরিবর্দ্ধন' -

ব্যবসায়ের এই আদর্শের নিশ্চিত পরিবর্ত্তন প্রয়োজন। আদর্শ হওয়া উচিৎ মানুষের সেবা, প্রয়োজনীয় বস্তুর সরবরাহ এবং ব্যসন বিলাসকে উৎসাহিত না করা, -- এর দ্বারা শরীর, মন, আত্মাকে বিনষ্ট করা হয়।

সরল জীবন-যাপন নিজেকে ফাঁকি দে'য়া নয়, বরং আত্ম-সন্তুষ্টি লাভ করা যায়, এটাই প্রকৃত সুখময় জীবন। যথার্থ ভ্রাতৃত্ববোধ এবং লভ্যাংশের মালিক এবং শ্রমিকের মধ্যে সমবন্টন, মালিক এবং শ্রমিক উভয়কে সমভাবে ধনী এবং সুখী করবে। খাদ্যের নিরাপত্তা, অসুখে চিকিৎসার ব্যবস্থা, বিনা ভাড়ায় যানবাহনের ব্যবস্থা, এবং বিনা খরচায় লেখাপড়া শেখার ব্যবস্থা মানুষকে একই দেশের এক পরিবারের বলে অনুভব করতে সাহায্য করবে। সরকার যথেষ্ট কর ধার্য্য করুন এবং সেই করের অর্থে জাতীয় পরিবারের সকলের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করুন। জীবন নির্বাহের মান সরল এবং সমতায় আনলে এবং নিত্য প্রয়োজনীয় আবশ্যকতার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করলে, অপরাধ এবং যুদ্ধ চিরতরে উবে যাবে কারণ তখন কেউই পরিত্যক্ত বিলাস-ব্যসনরূপ শয়তানের পরিপুষ্টির জন্য অর্থ সঞ্চয় করতে প্রলুব্ধ হবে না। ব্যসনরূপী শয়তান, দারিদ্র্য, স্বার্থান্ধতা, এবং আন্তর্জাতিক দ্বেষ-হিংসা তখন নির্বাসিত হবে। সমতা, শান্তি এবং ভ্রাতৃত্ব পৃথিবীতে অসম্ভব যতক্ষণ স্বার্থপরতা এবং বিলাস-ব্যসন থাকবে। ব্যক্তিগত এবং সমাজগত স্বার্থপরতা জাতির কল্যাণে পরিহার করতেই হবে এবং জাতীয় স্বার্থপরতাকেও পরিত্যাগ করতে হবে আন্তর্জাতিক শান্তির স্বার্থে, যাতে পৃথিবীর সংযুক্ত রাষ্ট্রের - এক দেশ এক পরিবারের প্রতিটি জাতি বিনা যুদ্ধে শান্তিতে বাস করতে পারে। উপরোক্ত হতাশার বীজ কারণগুলো সমূলে নাশ হউক, যুদ্ধ স্বয়ং উধাও হয়ে যাবে। বিদ্রোহ তখন অপরিচিত কথা হয়ে উঠবে। আমরা স্মরণ করতে পারি যে, সম্রাটের স্বার্থপরতায়, বিলাসের প্রাচুর্য্য এবং দারিদ্র্যের বিরাট ফারাকে, ভাই ভাইকে ক্রীতদাসের ন্যায় আচরণ করায়, এক ভাই অপরের আততায়ী হওয়ায়, এক ভাই অপর ভাইকে খুন করায়, একজন অপরকে মেরে ধনী হওয়ার প্রতিযোগিতায় সব মেতে ওঠায় পুঞ্জীভূত বিক্ষোভের রোষ ফেটে পড়ে এবং জারের পতন ঘটে। আজ আমরা শুনি রাশিয়া একমাত্র

DO NOT COPY

দেশ যেখনে বৃত্তিহীন বলে কোন সমস্যা নেই। সেখানে পথে-ঘাটে কাপুরুষদের কোন হানা নেই, যেখানে কোটিপতি নেই যারা নৃশংসতায়, হৃদয়হীন হাসির বানে অন্যদের বিদীর্ণ করতে পারে। অবশ্য রাশিয়া আজ যত উন্নত বলে মনে হউক না কেন, আমি ব্যক্তিগত ভাবে তাদের নতুন গণতন্ত্রের পথকে সমর্থন করি না। দেখা যাক এই গণতন্ত্র কতদিন চলে। এটা এসেছে মারামারি কাটাকাটি, অধ্যাত্মহীনতার পথে।

আমি অধ্যাত্ম-গণতন্ত্রে বিশ্বাসী, যার জন্য মহাত্মা গান্ধী প্রচেষ্টা করেছেন শান্তিময় প্রেমের পথে এবং বিলাসময়তা পরিহার করে। বিলাস-বহুলতা যদি মানুষ পরিত্যাগ করে, তাকে সকাল আটটা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্য্যন্ত দাসত্ব করতে হবে না। তাকে এ রকম ভুলে থাকতে হবে না সূর্য্য কখন উঠছে আর কখনই বা অস্তমিত হচ্ছে। প্রাতঃরাশ গলায় ঠুসে দৌড়াতে হবে না, অথবা ট্রেন ধরতে ট্রেনের সাথে পাল্লা দিয়ে পাগলের মত যান্ত্রিক হয়ে উঠতে হবে না, শ্রান্ত এবং ক্ষুব্ধভাবে বাড়ী ফিরে অবহেলিত অবলা স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়াও করতে হবে না। এ ধরণের যান্ত্রিক জীবন মানুষের জীবনকে তছনছ করে দিচ্ছে, অন্তর্মুখী, ধ্যান-নিমগ্ন, শান্ত, সমাহিত, সুখপ্রদ জীবনকে ধ্বংস করছে, এবং স্বার্থপরতা উন্নত যুদ্ধের দিকে এবং অতৃপ্ত বাসনার দিকে ঠেলে দিচ্ছে। যীশুর পথ এবং মহাত্মা গান্ধীর পথ সবই প্রদান করে -"প্রত্যেকে সবার তরে, এবং সবাই প্রত্যেকের তরে," এবং যোগদার ভূমিকাও তাই - সকলকে সুখী করে আত্ম-সুখ লাভ। এই তিনটি মাত্র পথ হতাশার বীজ দগ্ধ করার এবং অর্থনৈতিক অবস্থাকে সুসংহত করার। উপরন্তু এরা অপরাধ, দারিদ্র্য, যুদ্ধকে নিবারণ করার নিশ্চিত পদ্ধতি।

বৈষয়িক এবং অর্থনৈতিক সমতা এবং সরল জীবন যাপনের সমান মান বিলাস-চাঞ্চল্য পরিত্যাগ করে মানুষকে অধিকতর সময় সুযোগ দেবে পারিবারিক সুখ ভোগ, উন্নত আলোচনা শ্রবণে, শিক্ষা সম্বন্ধীয় অনুশীলনে; মানুষ ধ্যানে, শান্তিতে, ঈশ্বর সান্নিধ্যে থাকার অধিক সময় পাবে। আধ্যাত্মিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত

জনগণের সামগ্রিক মালিকানা ব্যষ্টি জীবনকে কখনই মাথাভারী করে কিংবা সম্পত্তি মর্টগেজের ভয়াবহতায় ব্যতিব্যস্ত করতে পারে না।

অধ্যাত্ম পদ্ধতিতে কি করে জাগতিক 'পৃথিবীর সংযুক্ত রাষ্ট্র' গঠন সুরু করা যায়?

ব্যক্তিগত, জাতিগত, এবং সমষ্টিগত স্বার্থপরতা উপরোক্তভাবে বিসর্জন দেবার পর, এখন আমি দেখাব কি করে কল্পনার সুখরাজ্য বা রামরাজ্য সৃষ্টি করা যায় এই জটিল মাথাভারী কর-পীড়িত সরকারী পদ্ধতির মধ্যে। রাজনৈতিক বিকাশ হতে হবে মন্থর অথচ কর্ম তৎপর হতে হবে এবং বিকাশ আধ্যাত্মিক পদ্ধতি সম্বলিত হওয়া চাই। আমি যা-ই বলি না কেন তাতে কিছু আসে যায় না, ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, বড় বড় সরকার ক্ষমতার দাপটে কখনই দেশপ্রেমী এবং বিজ্ঞদের কথায় কর্ণপাতও করে না, যতক্ষণ না ক্রমাগত ঈশ্বরীয় রীতিনীতি লঙ্ঘনের ফলে অনিবার্য সমস্যাদিতে জর্জরিত হয়। রাশিয়ার জারদের পতনে এটা পরিষ্কার পরিদৃশ্যমান। অতএব, আদর্শ সভ্যতার ছাঁচ প্রতিটি সম্প্রদায়ে ছোট ছোট গোষ্ঠীবদ্ধভাবে সুরু করা একান্ত বিধেয়, এদের জীবন হবে সুখ শান্তিতে ভরপুর, ধ্যান মগ্ন এবং পৌরুষময়। প্রতিটি গোষ্ঠীই হবে স্বয়ং-সম্পূর্ণ, আর্থিকভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত এবং তাদের মানসিকতা হবে উচ্চ-চিন্তা ও সরল জীবন-যাপন।

এভাবে একে পরিচালনা করতে হবে। পঁচিশ তরুণ দম্পতির একটি দল, অবিবাহিতও থাকতে পারে, নিয়ে শুরু করতে হবে একটি ছাঁচ। বিভিন্ন ছাঁচ এরকম থাকবে। প্রত্যেককে প্রথম পাঁচ বছর কঠোর পরিশ্রম করতে হবে এবং একাগ্রতা সহকারে সমগ্র শক্তি নিয়োগ করতে হবে যাতে প্রতিটি দম্পতি দশ হাজার ডলার সঞ্চয় করতে পারে। তা হলে সমষ্টিগত ভাবে তৈরী হবে একটি যৌথ মূলধন যার পরিমাণ হবে দু লক্ষ পঞ্চাশ হাজার ডলার। এর কিছু ব্যয় হবে পঁচিশটি ছোট ছোট কুটীর ক্রয়ে এবং নির্মাণে। পরিশ্রম নিজেদের এবং কুটীর নির্মাণ হবে কুড়ি-একর যৌথভাবে ক্রীত ভূমিতে। নিজেদের খামারে গরু পুষবে এবং দুধ মাখনের ব্যবস্থা তা' থেকে নিজেরাই করবে। অনুরূপে শাক-সব্জীর চাষ যৌথভাবে আপন খামারে

করতে হবে। শীত-প্রধান জায়গা হিসাবে উলের জামা-কাপড়, জুতো, বা অন্যান্য বস্ত্রাদির জন্য মেষ পালন করতে হবে। টুপীর প্রয়োজন নেই। দামী জুতোর দরকার নেই, হয় খালি পা থাকবে, নতুবা স্যান্ডেল পরবে।

বিবাহিতদের সন্তানদের শিক্ষার ব্যবস্থা হবে সাধারণ একটি হল-ঘরে যাতে কাঠের পার্টিশন থাকবে, অথবা গাছের তলায় গ্রীষ্মকালে। পড়াবেন উচ্চ-শিক্ষিত পিতা, মাতা বা সম্প্রদায়ে এমন যারা থাকবেন। ঈশ্বরকে জানা বা ধ্যান হবে প্রতিটি শিশুর জীবনাদর্শ। প্রতিটি দম্পতিকে একটি মাত্র সন্তানেই তুষ্ট হতে হবে এবং আত্ম-সংযমের অভ্যাস করতে হবে। সমস্ত কর বাবদ খরচ, শিশু শিক্ষার জন্য খরচ, এবং অন্যান্য সমস্ত খরচ যৌথ মূলধনের সুদ থেকে মেটাতে হবে। যখন পচিঁশটি শিশু বড় হয়ে যাবে, তখন তাদের কিছু কিছু আর্থিক সহায়তা দিয়ে তাদের প্রত্যেককে দশ হাজার ডলার উপার্জন করতে পাঠাবে। তারা এই কলোনিতে যে জ্ঞান অর্জন করেছে সেই একাগ্রতা, দিব্য-শিক্ষার শক্তিতেই সৎ-ভাবে তারা উপার্জন করবে। এই শিশুরা অতঃপর সম্পূর্ণ সাবালকত্বে অপর অধ্যাত্ম কলোনীর বর বা কনের পাণিগ্রহণ করবে। নতুন পঁচিশ তরুণ দম্পতি অনুরূপ নতুন কলোনী আবার গড়ে তুলবে তাদের পিতা মাতার অনুসরণে।

প্রশ্ন হল - "যখন মূল পরিবারের পঁচিশ জনই দেহত্যাগ করবে তখন দু লক্ষ পঞ্চাশ হাজার ডলার কি হবে?" এর সমাধান হল - অপর কোন পঁচিশ জনের দল অনুরূপ ভাবে নতুন কলোনি গড়বে।

প্রতিটি অধ্যাত্ম কলোনীর সভ্যদের ব্রত হবে সরল জীবন-যাপন এবং উচ্চ চিন্তন সম্বলিত হওয়া, মানুষে মানুষে ভ্রাতৃত্ববোধ, সর্বধর্মের সহ-অবস্থান, বিলাস-বাহুল্য বর্জন, সম্পদের যৌথ মালিকানা, যৌথ যানবাহন ব্যবস্থা, শিক্ষার ব্যবস্থা, খাদ্য সংরক্ষণ, পোশাক-আশাক খাদ্যাদির সম বন্টন, কিন্তু একে অপরকে অধ্যাত্ম

DO NOT COPY

অগ্রগতিতে বাধা দিবে না, প্রত্যেকেই গভীর থেকে গভীর ভাবে আত্ম-ধ্যানের প্রচেষ্টায় এগিয়ে যাবে।

যদি ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগতভাবে উপরোক্ত নিয়মে চলে, পৃথিবী স্বর্গরাজ্যে পরিণত হবে যেখানে সাম্য বিরাজ করবে, আবহাওয়া অনুকূল থাকবে, মারাত্মক সংক্রামক ব্যাধি, দুর্ভিক্ষ এবং দুরারোগ্য ব্যাধি অপসৃত হবে, তখন সমগ্র পৃথিবী একটি দেশে পরিণত হবে এবং পরস্পরের সহযোগিতা এমন হবে যে সকলেরই যানবাহন, খাদ্য, শিক্ষা, ধর্ম আন্তর্জাতিক নিয়মে চলতে থাকবে। বিলাসিতা, স্বার্থপরতা, অর্থলোলুপতা পরিত্যাগ কর এবং দুশ্চিন্তামুক্ত নিরাপদ জীবন যাপন কর। এটাই সার্বভৌম শান্তি এবং সাম্যের পথ।

কর্মরহস্য **অনিলবরণ**

আমি ছিলাম কর্মের আগ্রহী ভক্ত, এবং নিজেকে একটি বিরাট কর্মী মনে করতাম। কাজের টানেই কাজ করতাম; সর্বাধিক পরিমাণে কাজ করাকেই আমি সর্বশ্রেষ্ঠ গুণ মনে করতাম, এবং সকল সময়েই আমি আমার কর্মশক্তিকে সর্বতোভাবে প্রয়োগ করবার সুযোগ অন্বেষণ করতাম।

তখন বুঝতাম না যে আমি এক প্রকাণ্ড ভ্রান্তির বশে চলেছিলাম, যা আমি আমার কাজ মনে করতাম তা প্রকৃতপক্ষে আমার কাজ ছিল না, সে সব আমার মধ্যে প্রকৃতির খেলা মাত্র; যখন আমি খুব কাজ করছি মনে করতাম তখন বাস্তবিকই প্রকৃতির শক্তির হাতে অসহায় যন্ত্ররূপে চালিত হতাম। অজ্ঞানতার বশে আমার মধ্যে প্রকৃতির কার্য্যাবলীর সাথে নিজেকে এক করে দিতাম, কর্মফলের উপর

DO NOT COPY

সবিশেষ আগ্রহ রাখতাম; মনে করতাম কর্মফলে আমারই অধিকার। ঐ খেলা অনির্দিষ্টকাল চলেছিল, এক মন্ত্রমুগ্ধ ক্রীতদাসের জীবন আমি যাপন করতাম।

অবশেষে ভগবৎ করুণায় আমার চক্ষু উন্মীলিত হোল, এবং মুক্তির সত্যপথ দেখতে পেলাম, স্বাধীনতার প্রকৃত স্বাদ পেলাম। আসক্তি এখনও সম্পূর্ণভাবে যায়নি, এখনও আমি প্রকৃতির যন্ত্রবৎ খেলায় নিজেকে হারিয়ে ফেলি। জগন্মাতা আমার মধ্যে কাজ করেন। অথচ আমি ভাবি আমার অহংই কাজ করেছে, তাই কর্মফলকে আমার অহমিকার দিক থেকেই বিচার করি।

হে জগন্মাতা, এই অহমিকা এই আসক্তিকে আমার ভেতর থেকে একেবারে দূর করে দাও; নিম্ন প্রকৃতি থেকে আমি যেন সর্বতোভাবে মুক্তিলাভ করতে পারি। আমি একজন শ্রেষ্ঠ কর্মী এবং প্রকৃত স্বাধীন ব্যক্তি তখনই হতে পারবো, যখন দিব্য জননীর সহিত আমার একত্ব সর্বাঙ্গীন হবে।

ছোট বা বড় যে কাজই আমরা করি না কেন, সবই সঠিকভাবে করা প্রয়োজন; প্রত্যেকটি কাজ করবার একটি প্রকৃষ্ট পন্থা আছে। কিন্তু আমাদের অহমিকা-পূর্ণ অজ্ঞতায় সকল কাজই আমরা যেমন তেমনভাবে শেষ করি। আমরা অন্ধকারে হাতড়াই, হোঁচট খেয়ে পড়ে যাই, এবং যেন দৈবক্রমেই কৃতকার্য হই।

সকল রকমের শক্তির দিকেই আমাদের সত্তা উন্মুক্ত; ঐ সব শক্তি আমাদিকে সবদিক থেকেই টানাটানি করছে। মন আমাদের সদাই চঞ্চল, কোনও একটি বিষয় নিয়ে অধিকক্ষণ লিপ্ত থাকতে পারে না। আমাদের দেহ বাঁধাধরা অভ্যাস আর সহজ প্রবৃত্তির বন্দী, তাই সে স্বাধীন ক্রিয়ার পরিপন্থী। আমাদের আপন শক্তির উপর আমরা নির্ভর করি এবং করে ভাবি যে ফলাফল আমাদের প্রচেষ্টার দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত। আমরা আমাদের ব্যক্তিগত তৃপ্তি এবং বাসনার পরিপূর্তি চাই, স্বার্থপূর্ণ কামনা ও অনুরাগ নিয়েই আমরা বিব্রত হই। আমরা অধৈর্য্য, অস্থির, চঞ্চল; কখন

DO NOT COPY

উত্তেজিত, কখন বা অবসাদগ্রস্ত, আর প্রায়ই অনবহিত। সুতরাং এতে বিস্মিত হবার কিছুই নাই যে আমাদের সর্বাধিক প্রচেষ্টা অকিঞ্চিৎকর ফল প্রদান করে, এবং সকল কাজের পশ্চাতে থেকে যায় অপ্রিয় প্রতিক্রিয়া আর বন্ধন।

অহমিকার উপরে ওঠাই নিষ্কৃতির পথ; কেবলমাত্র জগন্মাতার জন্যই, তাঁর শক্তিতে এবং তাঁর ইচ্ছায় চালিত হয়ে কাজ করতে হবে এবং কাজের ফলাফল তাঁরই হাতে সমর্পণ করতে হবে। আমাদের কী করা অবশ্য কর্তব্য তাহাই আমরা দেখবো, এবং সর্বান্তঃকরণে তা করে যাবো। জগন্মাতার সহিত যোগযুক্ত হয়ে, তাঁহারই জন্য, তাঁহাকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করে যদি আমরা কাজ করি তাহলে আর আমাদের কাজে ভুল হবে না, কোনও শোকই আমাদিকে স্পর্শ করবে না। অবশেষে এক অবস্থা উপস্থিত হবে যখন জগন্মাতা আমাদের সকল কাজ গ্রহণ করবেন। তখনই আমাদের সকল কর্ম নিখুঁত এবং দিব্য হবে।

কর্ম একটি বিরাট শক্তি; কর্মের মাধ্যমে আমরা জগন্মাতার সহিত যোগাযোগ স্থাপন করতে পারি। কাজ করায় কোনও অপরাধ নাই। কাজের পিছনে আমাদের ভ্রমাত্মক হাবভাব এবং অজ্ঞানতা প্রসূত পদ্ধতিই কাজকে আমাদের বন্ধন করে তোলে।

ব্যক্তিগত লাভের জন্য আমরা কাজ করি এবং অজ্ঞানতার বশে ভাবি যে আমাদের কাজের ফলাফল আমাদের ব্যক্তিগত চেষ্টার উপর নির্ভর করছে, এবং আমাদের জীবন, আমাদের অস্তিত্বই নির্ভর করছে এ কাজের উপর। তাই আমরা আশা ও আশঙ্কায় দোলায়িত হই, সফলতায় বিফলতায় উদ্বিগ্ন হই। ঐরূপ চাঞ্চল্য অজ্ঞতা এবং অহমিকা নিয়ে যে কাজ করা হয় তাহা অসম্পূর্ণ এবং ভ্রমাত্মক হয়, এবং প্রতিক্রিয়া স্বরূপ অনিবার্যরূপে শৃঙ্খল সৃষ্টি করে যা আমাদিকে নিম্নতর জীবন ধারায় আবদ্ধ রাখে। অহমিকা পূর্ণ বাসনা এবং ব্যক্তিগত অভিপ্রায়ের প্রয়োজনীয়তা জীবনের নিম্নতম ধাপে আছে। যখন আমরা উপরে উঠতে চাই এবং আমাদের

DO NOT COPY

জীবনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে চাই, তখন ওরা বিরাট বাধাস্বরূপ হয়ে পড়ে এবং সত্যকে আমাদের কাছ থেকে আড়াল করে।

অজ্ঞানতার বশেই লোকে ভাবে যে অহমিকা প্রণোদিত অভিপ্রায় নিয়ে কাজ না করলে কাজ চলতেই পারে না। প্রত্যেক জীবনেরই একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য আছে, দিব্য উদ্দেশ্য আছে যা তাকে সম্পন্ন করতে হবে। কাজের জন্য যে প্রেরণা আমরা বোধ করি তা আমাদের প্রকৃতির মূল আবশ্যকতা থেকে উত্থিত হয়। নিম্ন প্রকৃতির বিক্ষুব্ধি থেকে যদি আমরা মুক্ত হতে পারি তাহলে আমাদের উচ্চ প্রকৃতি আপনা হতেই যথার্থ কাজের মাধ্যমে যথার্থভাবে প্রকাশিত হবে। অন্ধভাবে অযথা নিজের শক্তি ক্ষয় না করে আমরা শান্তভাবে আস্পৃহা করবো যাতে জগন্মাতার অভীপ্সিত কাজ কি তা আমরা জানতে পারি, এবং ঐ কাজ সর্বান্তঃকরণে সম্পন্ন করতে পারি। ঐরূপ অব্যক্তিক এবং নিবেদিত কার্যের সাহায্যেই আমরা ক্রমে ক্রমে জগন্মাতার সহিত আমাদের যোগাযোগ এবং একত্ব উপলব্ধি করবো।

কাজ আমাদের সাধনার অঙ্গস্বরূপ হতে পারে যদি তা আমাদিকে দিব্য জননীর সান্নিধ্যে যেতে সাহায্য করে। অন্যথা, কাজ হয়ে পড়ে বাধা স্বরূপ, শক্তি এবং সময়ের অপচয় মাত্র, আমাদের প্রাণ প্রকৃতির অজ্ঞান আকাঙ্খাকে প্রশ্রয় দেওয়া।

যতদিন পর্যন্ত কাজে আমরা আসক্ত থাকি এবং আমাদের শক্তি সমূহের অহমিকা প্রণোদিত খেলায় মত্ত রহি, ততদিন পর্যন্ত কাজ আমাদিকে নিরুপায়ভাবে নিম্নতর জীবনে আবদ্ধ রাখে, এবং ভগবানের উপস্থিতিকে আমাদের দৃষ্টির আড়াল করে। কিন্তু কাজকে ভগবানের সেবায় উৎসর্গ করলে তা আর বন্ধনের কারণ হয় না, তখন কাজ নিজেই মুক্তিপ্রদায়ী শক্তিতে পরিণত হয়।

কাজ আমাদের প্রকৃতির অপরিহার্য আবশ্যকতা। আমাদের ঊর্দ্ধ গমনের পথে সাহায্যকারীরূপে কাজকে ব্যবহার করতে হবে এবং তার জন্য আমাদের

কাজকে অধিকতররূপে স্বার্থশূন্য এবং জগন্মাতার সেবায় নিবেদিত করতে হবে। এই রূপে পবিত্র হয়ে আমরা দিব্যজননীর প্রত্যক্ষ স্পর্শ পাবো, তাঁর বাণী অন্তরে শুনবো, তাঁর সৃষ্টি নির্দেশ এবং অনুপ্রেরণা লাভ করবো। কাজ তখন হয়ে পড়ে অতি আনন্দদায়ী এবং রূপান্তর সাধনের বৃহৎ শক্তি।

ক্রমে ক্রমে আমরা বোধ করবো যে আমরা দিব্য জননীর হাতে যন্ত্র মাত্র, এই জগতে তাঁর প্রকাশের একটি পন্থা মাত্র; আমাদের কাজে তাঁরই শক্তির খেলা দেখবো। কাজের উপর অজ্ঞানতাবশতঃ আসক্ত না হয়ে কাজের মধ্য দিয়ে জগন্মাতার সহিতই আমরা যুক্ত হব। কাজ আমাদের ভক্তিকে আরও নিখুঁত এবং আনন্দপূর্ণ করবে; এইরূপে ভক্তিপূর্ণ কাজ এবং সক্রিয় ভক্তির সাহায্যে আমরা আরো শক্তি এবং আনন্দের পথে অগ্রসর হব, এবং পরিশেষে দিব্য জননীর চেতনার সহিত একত্ব লাভ করবো।

আমরা মনে করি যদি আমরা মনের সাহায্যে অনবরত কাজ না করি তাহলে আমাদের সকল কাজ থেমে যাবে এবং আমাদের সমগ্র জীবন বিশৃঙ্খলায় পূর্ণ হবে। ঐ অজ্ঞান ধারণা থেকে মুক্ত না হলে আমরা উচ্চ জীবনের পথে কখনই অগ্রসর হতে পারবো না।

বাস্তবিকপক্ষে প্রকৃতি আমাদের মনকে একটি যন্ত্রবৎ তার নিজস্ব উদ্দেশ্য সাধনের কাজে ব্যবহার করে। দেহের সাধারণ কাজকর্ম স্বাভাবিক প্রেরণার বশে আপনা হতেই নির্বাহ হয়। মন কেবল গোলযোগেরই সৃষ্টি করে যখন সে তার চিন্তা, বদ্ধমূল ধারণা, এবং বিশ্বাস নিয়ে দেহের কাজে মধ্যস্থতা করতে যায়। দেহের নিজস্ব চেতনা আছে, এবং স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ পেলে সে তার নিজস্ব সীমার মধ্যে বেশ সুচারুরূপে কাজ করে যেতে পারে। মন ব্যবহৃত হয় আরও জটিলতর কাজে; কিন্তু নিজের কাজও মন দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে অসম্পূর্ণভাবে সম্পন্ন করে। আমাদের কাজ তখনই নিখুঁত হবে যখন আমরা প্রকৃতির এই নিম্নতর ক্রিয়াকর্মের উপরে

উঠবো এবং আমাদের সকল কর্ম উৎসর্গ করতে পারবো, উপর থেকে অতিমানসিক শক্তি দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে আরদ্ধ এবং চালিত হবার জন্য। দেহকে অধিকতর রূপে সচেতন এবং উন্মুক্ত করতে হবে, যাতে সে উপর থেকে প্রেরণা গ্রহণ করতে পারে এবং তদনুযায়ী কাজ করতে পারে; মন শুধু যোগাযোগের স্বাধীন এবং উন্মুক্ত পথ রূপে কাজ করবে।

আমাদের দেহ ও মনকে শান্ত এবং মুক্ত করতে হবে, সত্যের অভিমুখে তাকিয়ে খুলে ধরতে হবে; কেবল তখনই আমাদের কাজ হবে সর্বাঙ্গ সুন্দর, হবে আমাদের মধ্যে এবং আমাদের মাধ্যমে দিব্য ইচ্ছার প্রকাশ স্বরূপ।

তিন নদীর দেশ – মুন্নার **শ্রী অরূপ কুমার ভট্টাচার্য**

প্রাচ্যের ভেনিস কেরালাকে বলা হয় ভগবানের আপন দেশ। দৈর্ঘ্যে ৫৫০ কিলোমিটার হলেও প্রস্থে মাত্রই ১২০। মুন্নার ছাড়া পাহাড়ি শহর বলতে আর তেমন কিছু না থাকলেও প্রকৃতি যেন দু'হাত ভরে সাজিয়েছে এই নারকেলের দেশকে, (কেরা অর্থ নারকেল আর আলয় মানে দেশ)। রাজ্যের পশ্চিম জুড়ে গাঢ় নীলাভ আরবসাগরের পারে কোভালম সহ বেশ কিছু অসাধারণ বীচ, পূবে ৫০০ থেকে ২৭০০ মিটার উচ্চতার চিরশ্যামল পশ্চিমঘাট পাহাড়ের কোলে মশলা আর চায়ের বাগান। রয়েছে কোচি, কোল্লাম আর আল্লাপুঝার ব্যাকওয়াটারে জল-বিহারের সুযোগ, থেক্কাডি, কুমিলি, পেরিয়ারে বন্যজন্তু দেখার আশায় লেকের জলে সরকারি লঞ্চে ভেসে পড়া, মুন্নারের মাট্টুপেট্টি ড্যাম অথবা ইকো-পয়েন্ট সহ অগুন্তি পাহাড়ি ঝর্ণা, সর্বোপরি চোখ মন সব সবুজ করে দেওয়া মুন্নারের মত পাহাড়ি শহর! ঈশ্বরের

DO NOT COPY

বাসভূমি তো কেরালাকে এমনি এমনি বলা হয় না। আর মুন্নার? সে যেন সেই ঈশ্বর ভবনের পূবের খোলা বারান্দা। সেখান থেকে দৃষ্টিটা ছড়িয়ে দিয়ে যা কিছু সঞ্চয় করে এনেছি, তাই আজ এবারের গল্প।

গল্পটা শুরু হয়েছিল গত ২৫শে নভেম্বর শালিমার ষ্টেশনের ২ নম্বর প্লাটফর্ম থেকে। ১৫টা ২০-র ১২৮৪১ করমণ্ডল এক্সপ্রেস ষ্টেশন ছাড়তে একটু দ্বিধা করায় চেন্নাই থেকে কানেক্টিং ট্রেনের কথা ভেবে যে ধুকপুকুনিটা শুরু হয়েছিল বিষ্ণু ট্যুর অ্যান্ড ট্রাভেলসের চায়ের সঙ্গে টা আসতেই সেটা পেটের মধ্যে উধাও। হ্যাঁ, আমাদের ২৯ জন কেরালা-সাথীর সারথি এবার বিষ্ণুর কার্তিক আর মিতুন।

ট্রেন ক্রমশঃ লেট করতে থাকলেও ঘুমের অন্ধকারে সেটা কিভাবে মেকআপ করে নিল জানতে পারিনি। সকালে রাজামুন্দ্রির কাছে গোদাবরী আর বিজয়ওয়াড়ার কাছে কৃষ্ণা আমাদের ব্রেকফাস্ট আর লাঞ্চকে আরো উপাদেয় করে তোলার পর ট্রেন যেভাবে ছুট লাগিয়েছিল তাতে সময়ের ঘন্টাখানেক আগে চেন্নাইতে ঢুকে পড়লেও বলার কিছু ছিল না। শেষপর্যন্ত অবশ্য যথাসময়ে বিকেল ঠিক পাঁচটায় চেন্নাই-এর চার নম্বর প্লাটফর্ম আমাদের বলে দিল ঘন্টা চারেকের বিশ্রাম আমাদের কনফার্মড। আমাদের কোচি যাওয়ার ট্রেন ২২৬৩৯ আলেপ্পি এক্সপ্রেস ৬ নম্বর প্লাটফর্ম থেকে ছাড়বে ঠিক ২০টা ৫৫-তে। এই অবসরে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম ম্যারিনা বীচটা ঘুরে আসাই যেত, তবে নতুন প্রেমের টানটা বেশি বলেই হয়ত আলেপ্পি- মুন্নারের ভাবনায় পুরনো সম্পর্ক ঝালাতে আর আগ্রহী হইনি – হ্যাঁ, ম্যারিনার হাতছানিও সেখানে ব্যর্থ।

পরদিন সকালে এর্ণাকুলাম জংশনে পৌঁছে সারাদিনে কোচির ব্যাকওয়াটার লেকে ক্রুজ-বিহারের মধ্য দিয়ে উইলিংডন সহ নানান দ্বীপ, চাইনিজ ফিশিং নেট,

ভাস্কো দ্য গামার সমাধি সহ ভারতের প্রাচীনতম চার্চ সেন্ট ফ্রান্সিস আর কোচি হ্রদের সাথে আরবসাগরের মেলামেশায় যা পেয়েছি, সব ম্লান হয়ে গেছে মোহনার বুকে সেদিনের শেষ সূর্যকে ডুবতে দেখে। এমন আলোকচ্ছটা যে আগে দেখিনি তা নয়, কিন্তু ফোর্ট কোচির সৈকত বেলাতে দাঁড়িয়ে অদূরে সাদা বিশাল ক্রুজটাতে যেমন লালের ছোঁয়া লাগলো এমনটাতো আগে কখনো দেখিনি।

পরদিন সাত সকালে ব্রেকফাস্ট শেষ হতেই শুরু আমাদের কোচি ছেড়ে মুন্নারের পথে চলা। বিষ্ণুবাহন এবার রাণী কোম্পানীর বিশাল চল্লিশ সিটের এ.সি. বাস। ঝাঁ চকচকে আমাদের শ্বেতবাহন যে আরামদায়ক তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু পাহাড়ি পথে তার গতি কেবল কচ্ছপকেই হার মানাতে পারে। কোচি থেকে ১২৮ কিলোমিটার পূবের মুন্নারে চলতে চলতে ৮০ কিলোমিটার পার হয়ে 'চিয়াপ্পারা' জলপ্রপাত। কোচি-মাদুরাই হাইওয়ের উপর ইদুক্কি জেলার এই প্রপাত সাতটি ধাপে নাচতে নাচতে নেমে এলেও এর উৎস অথবা উচ্চতা কিছুই জেনে উঠতে পারিনি। সবজান্তা গুগুলও এই বিষয়ে নীরব। হয়ত লীলায়িত চিয়াপ্পারা দেখে সেও আমাদের মত মায়ার খেলায় মত্ত।

পশ্চিমঘাটের হিলস্টেশন কেরালার মুন্নার সমুদ্রতল থেকে প্রায় ৫২৫০ ফুট উচ্চতায়। তবে আশেপাশের চায়ের বাগান এবং অবশ্যই 'অ্যানামুডি পিক'-কে হিসেবে নিলে মুন্নার অঞ্চলের উচ্চতা ৪৭৬০ থেকে ৮৮৪২ ফুট। শহরের কাছে-দূরে, চলার পথে ঝর্ণার ধারা যতই ঝরুক, এখানকার সেরা দ্রষ্টব্য অবশই মাট্টুপেট্টি ড্যাম, ইকো-পয়েন্ট আর টপ স্টেশন। চা অথবা কফি বাগানের কথা আর আলাদা করে বলছি না কারণ মুন্নার শহরটাই তো একটা সবুজ চায়ের বাগান – সেখানে

DO NOT COPY

যেতে হয় না, সে আপনি এসে ধরা দেয়। আর রয়েছে রাজমালাই ফরেস্ট তথা ইরাভিকুলাম ন্যাশনাল পার্ক, যার সাথে পরিচয় না ঘটলে মুন্নারে আসাই বৃথা।

লাঞ্চের পর আড়াইটে নাগাদ ড্যাম দেখতে বেরিয়ে প্রথমেই চলে আসি বাঁধ পেরিয়ে এখানকার 'ইকো-পয়েন্টে'। মুথিরাপুঝা, নাল্লাথান্নি, আর কুণ্ডলা পাহাড়ে ঘেরা সবুজ বনানীর মাঝে মাট্টুপেট্টি থেকে টপ স্টেশনের পথে ছয় কিলোমিটার দূরত্বে ওই তিন নদীর জল থেকে তৈরী লেকের পাশে অপূর্ব পিকনিক স্পট এই ইকো-পয়েন্ট। দূর থেকে লেকের সবুজ জল দেখা গেলেও তিন পাহাড়ের ধাক্কায় প্রতিধ্বনিত শব্দ শুনতে দশ টাকার টিকিট কেটে লেকের ধারে আসতেই হয়। এখানকার তিন নদীর নামও কিন্তু একই – ঐ পাহাড়ের নামে নাম মিলিয়ে। এই কারণেই হয়তো পাহাড়ি শহরটার নাম মুন্নার। মুন্নার মানে তো তিন নদীর দেশ।

মুন্নারে হানি-বি ট্রি, মরশুমি ফুলের ব্লসম পার্ক, দুরন্ত চিন্নাকানাল আর পল্লিভাসাল জলপ্রপাত ছাড়া সবচেয়ে যা মন কেড়েছে তা হল তিন নদীর সঙ্গমস্থলে বাঁধ দিয়ে তৈরি হওয়া পল্লিভাসাল হাইড্রো-ইলেকট্রিক প্রোজেক্ট। ইকো-পয়েন্ট থেকে ফেরার বেলায় পায়ে পায়েই পার হয়ে যাই তিন নদীর জলে পুষ্ট মাট্টুপেট্টি ড্যাম। দূর থেকে দেখতে পাই সবুজ পাহাড় কেমন ডাক দিয়েছে সবুজ গাছের সারিদের কাছে পেতে। পায় না – মাঝে যে অথৈ লেকের বিস্তার! শ্যামলা সে হ্রদের জলে ছোট ছোট ঢেউ খেলে। পাহাড় থেকে জঙ্গলে উড়ে বেড়ায় রঙ বেরঙের প্রজাপতি আর নীল পাখার বাজরিগার। আর আমরা? টপ পয়েন্ট না, তিন কিলোমিটার দূরের পোথামেডু ভিউ পয়েন্ট থেকে সূর্যাস্ত দেখব ভাবতে ভাবতেই লাল সূর্য ডুবে গেল মাট্টুপেট্টির ২৭০ ফুট নীল গভীর জলে।

মুন্নারের অন্যতম আকর্ষণ রাজমালাই ফরেস্ট তথা ইরাভিকুলাম ন্যাশনাল পার্ক। আমাদের হোটেল 'ইডেন হলিডেজ্' থেকে রাজমালাই মাত্রই এগারো

DO NOT COPY

কিলোমিটার। তাই ব্রেকফাস্ট সেরে বার হয়েও পার্কে পৌঁছে গেছিলাম সকাল ন'টার আগেই। এত সকালে লোক তেমন জমেনি। তাই জনপ্রতি ২০০ টাকার টিকিট নিতে কাউন্টারে প্রায় দাঁড়াতেই হয়নি। কাউন্টারের প্রায় পাশ থেকেই পার্কের বাস ছাড়ছে ভিউ পয়েন্টে নিয়ে যাবে বলে। অনেক বাস, লাইন দিয়ে একেকটার সিট ভর্তি করে ফেললেই তারা চলতে শুরু করে পশ্চিমঘাটের সুন্দর দৃশ্য আপনার সামনে তুলে ধরবে বলে। চলার পথে রয়েছে একাধিক ঝর্ণা, ভাগ্যে থাকলে দেখতে পাবেন সম্বর, গাউর এমনকি হাতিও। তবে রাজমালাই বিখ্যাত এর বিরল প্রজাতির নীলগিরি তাহ্‌রের জন্য। বাঁকানো শিঙের ছাগল সদৃশ সে প্রাণী আমরা দেখেছি তবে তা ভিউ পয়েন্টে নয়, সেখানে টিকিট দেখিয়ে পাহাড়ি পথে চূড়ায় চাপার চেষ্টা করতে গিয়ে। শুনেছিলাম বাসপথের শেষে নাকি ব্যাটারি চালিত ছোট গাড়ি আছে টপ পয়েন্টে নিয়ে যেতে। তেমনটা অবশ্য ছিল না। তাই যার যেমন সাধ্য ততটা পাহাড়ে চড়েই ফিরে আসতে হয়েছিল ভিউ পয়েন্টের দরজায়। ট্রেকাররা চাইলে এই পথ ধরেই উঠে যেতে পারেন পশ্চিমঘাট পর্বতমালার সর্বোচ্চ শৃঙ্গ অ্যানামুডিতে। আমরা অবশ্য ৮৮৪২ ফুট শৃঙ্গে ওঠার দম আছে কিনা পরখ না করে তাকিয়েছি দিগন্তব্যাপী পাহাড়ের বিস্তারে ৯৭ কিলোমিটার বিস্তৃত ইরাভিকুলামের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের দিকে। দুই পাহাড়ের মাঝখানে আটকে পড়া মেঘ যেমন চোখ টেনেছে, কল্পনার চোখে তেমন ধরা পড়েছে এখানকার 'নীলাকুরুঞ্জি' ফুল। ১২ বছর অন্তর যখন পাহাড়ের ঢালে সে ফুল নীল কার্পেট বিছিয়ে দেয় তখন কেরালার প্রতিটি পর্যটকের ঠিকানা যে মুন্নার হবে তাতে আর সন্দেহ কি? শেষ ফুল ফুটেছে ২০১৮ সালে। স্বাভাবিক নিয়মে আবার সে আসবে ২০৩০-এ। আমরা শুধু মিউজিয়ামেই তার ছবি দেখেছি। ২০৩০ যে এখনও অনেক দূর!

আমাদের হোটেলের পিছন দিয়ে মাট্টুপেট্টির ওভার ফ্লো বয়ে চলায় তার কলকলানিও হোটেলকে অতিরিক্ত আকর্ষণীয় করে তুলেছিল। তাই মুন্নার ছেড়ে কুমিলির পথে যখন গাড়ি গড়িয়েছে, সেই কল্লোলিনীর বিরহ একটা মনখারাপ করা দুপুর যদি এনে দিত বোধহয় অবাক হতাম না। ভুলে গেছিলাম মুন্নার-থেক্কাডির

অসাধারণ পথটার কথা। শুধু শাহরুখের ‘চেন্নাই এক্সপ্রেসে’র জন্যই নয়, সবুজ চায়ের রাজ্যে এমন উড়ে চলার রাস্তা যে কোনও দুখি-মনকে সপাটে বাউণ্ডারির বাইরে ফেলে দেবে। তারপর আবার পেরিয়াক্যানাল জলপ্রপাত! দুঃখ-বিলাসের অবকাশ কোথায়? অবশেষে মুন্নার- থেক্কাডি রোডের ওপর চক্রমুডি পাহাড়ের কোলে ‘লোকহাট টি পার্ক।’ এ যেন মুন্নারের শেষ বিদায় সম্ভাষণ। জনপ্রতি মাত্র পঞ্চাশ টাকার বিনিময়ে শুধু যে চায়ের বাগানে ফটো সেশনের সুযোগ, তা তো নয়! চা শ্রমিকদের সাথে মিলেমিশে চায়ের গন্ধে মাতোয়ারা হয়ে অনাবিল এক সবুজ সাগরে হারিয়ে যাওয়ার আনন্দ। মন চায়না এ আনন্দ-নিকেতন ছেড়ে যেতে, তবু যেতে হয়। পেরিয়ার টাইগার রিজার্ভের শহর কুমিলি আর থেক্কাডি যে আমাদের ডাক দিয়েছে।

মুন্নারের চা বাগান

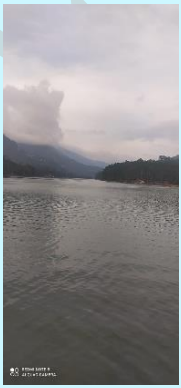

মাট্টুপেট্টি ড্যাম, মুন্নার

নীলগিরি

মশলা বাগান

(চিত্র গ্রহণঃ লেখক)

অজানার ঠিকানায় **শ্রীলা মৈত্র**

দিনান্তের ম্লান সূর্য পশ্চিমের দিক চক্রবালে
ক্লান্ত হাসি হেসে
বিদায় জানায় পৃথিবীকে।
এখনি দিকে দিকে
সুরু হবে শঙ্খ ঘণ্টা ধ্বনি।
হে মহাকাল
আমি বসে আছি শুনিতে
তোমার অলস নূপুরের শিঞ্জিনী।
তারপর তোমার মধুর ইশারায়
কালের যাত্রা
অজানার ঠিকানায়।

DO NOT COPY

চেনা না-চেনার রোজনামচা

সুনন্দন ঘোষ

বিস্তীর্ণ জীবন ধরে অনেক পথ তো হাঁটলাম একসাথে,
এখনও কেন মুহূর্তগুলো আসে অ-চেনার?
কতগুলো দশক একসাথে পাড়ি দিয়েছি ঝড়ের খেয়ায়,
পাহাড়ী কুয়াশায় ঝাপসা হয়ে গেছে
অতি চেনা মুখ,
জঙ্গলের নিবিড়ে ছেড়ে গেছে হাতের আগল,
তখনও খুঁজে নিয়েছি একে অপরকে।
এরপরেও থেকে যায় অবিশ্বাস ?

নোটিশ তো এসে গেছে চিত্রগুপ্তের,
চুলে, দাঁতে, কিডনি, লিভার, রক্তে।
আর কতদিন অপরের ভুল খুঁজতে গিয়ে
অহংয়ের গোলকধাঁধায় নিজের পথ হারানো?
কতদিন ভুলে থাকা অতীতকে ?

ভুল তো থাকেই জীবনভর,
না থাকলেও ভুল ধরার জন্য থেকে যায় অর্ধেকটা পৃথিবী,
নিজেরা কেন মেতে উঠি ভুল খোঁজার খেলায়?

যে যায় সে ফিরে আসে না;
যে এসেছে সে যেন ফিরে না যায়।

DO NOT COPY